বইমেলা সংখ্যা

বেঙ্গল টাইমস

KOLKATA BOOK FAIR
BUY BOOKS WIN LIBRARY
BUMPER LOTTERY

বইয়ের মহাসমুদ্রে

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

বেঙ্গল টাইমস

বইমেলা সংখ্যা ২০২৫

সূচিপত্র

অযোধ্যা নয়, দাদু–নাতিতে বইমেলায়
❑ সুরঞ্জন পাত্র

পড়া আর শোনা দিব্যি মিশে গেছে
❑ মলয় সেন

আমার ঠিকানা ওই লিটল ম্যাগাজিনের প্যাভিলিয়ন
❑ সুকর্ণ সিনহা

গোটা বইমেলা চত্বরই তাঁর স্টল
❑ পারিজাত সেন

ভাগ্যিস বিদেশিরা বাংলা পড়তে পারেন না
❑ সরল বিশ্বাস

ধন্যবাদ লকডাউন, বই পড়ার অভ্যেস ফিরিয়ে দিলে
❑ নিখিল সেন

জয় গোস্বামীর থেকে ঋতুপর্ণার কদর বেশি!
❑ রাহুল বিশ্বাস

আ কেসস্টাডি অন বাংলা বই বিপণন
❑ অর্ণব চ্যাটার্জি

বইমেলা বললে সেই ময়দানকেই মনে পড়ে
❑ অরিত্র ঘোষাল

ফিরে এসো, ময়দান

❑ স্বরূপ গোস্বামী

লেখক কিন্তু নজর রাখছেন

❑ উত্তম জানা

সামাজিক উপন্যাসে পাঠক উদাসীন কেন?

❑ নীলাদ্রি গুপ্ত

নন্দ ঘোষের কড়চা

পথে এসো বাবাজীবন

স্মৃতিটুকু থাক

bengaltimes.in

ISSN 2445 5657

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সেল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন ৯৮৩১২২৭২০১।

ওয়েবসাইট bengaltimes.in ISSN 2445 5657

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

এই মশাল জ্বলতেই থাকুক

কথায় আছে, বাঙালির বারো মাসে তের পার্বণ। চারিদিকে যে হারে মেলার হিড়িক, এখন আর সংখ্যাটাকে তেরতে বেঁধে রাখা যাবে না। শীরদোৎসব বা দীপাপলির কথা ছেড়ে দিন। আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু তার বাইরে সামাজিক উৎসব! নিশ্চিতভাবে বাকি সব উৎসবকে দশ গোল দেবে বইমেলা। আন্তর্জাতিক আসরে বাঙালি যে কয়েকটি ব্যাপারে গর্ব করতে পারে, বইমেলা নিশ্চিতভাবে সামনের সারিতে থাকবে। বারোদিন ধরে এত মানুষের সমাগম, এত বইয়ের ক্রয়-বিক্রয় বিশ্বের কটা শহরে হয়?

দীর্ঘদিন বইমেলা হয়ে এসেছে ময়দান চত্বরে। অনেকের কাছে বইমেলা আর ময়দান যেন সমার্থক হয়ে আছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ঠিকানাই বদলে যায়। করুণাময়ী চত্বরে বইমেলা পেয়েছে তার স্থায়ী ঠিকানা। জায়গাটা হয়ত একটু ছোট। কিন্তু যোগাযোগের দিক থেকে যতটা দুর্গম ছিল, এখন আর ততখানি দুর্গম বলা যাবে না। নানা দিকের বাস, অটো যেমন আছে, তেমনই নতুন সংযোজন মেট্রো। শিয়ালদার সঙ্গে

জুড়ে গেছে। হাওড়ার সঙ্গে জুড়ে গেলে আসা–যাওয়া আরও মসৃণ হতে পারে। তখন কলকাতা বইমেলা আর নিছক কলকাতার থাকবে না। শহরতলিও আবার সামিল হবে।

এখন অনলাইন ডেলিভারিতে ঘরে বসেই বই পাওয়া যায়। কলেজ স্ট্রিটে গেলে ডাবল ডিসকাউন্টও পাওয়া যায়। যত সহজ বিকল্পই আসুক, তবু বইমেলা ইজ বইমেলা। এর সঙ্গে আর কোনও মেলার তুলনা চলে না। এত মানুষের ভিড়। সবাই কি বই কেনেন? বইয়ের দোকানে যেমন ভিড়, ফুডস্টলের ভিড়ও বেশি বই কম নয়। কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলেন, এটা মূলত খাদ্য-মেলা, যেখানে বইও পাওয়া যায়। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শহরের নানা প্রান্তে নানা নামে খাদ্য মেলার তো অভাব নেই। সেখানে তো শুধুই খাবার। বইয়ের উৎপাত নেই। তাহলে সেখানে এমন ভিড় হয় না কেন? তাহলে, কোথাও একটা বইয়ের মাহাত্ম্য আছে বইকি। সেটা বোঝা যায়, যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামে। বা বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। একেকটা স্টলের বাইরে এঁকে বেঁকে দীর্ঘ লাইন। শুধু একটু বই নেড়েচেড়ে দেখার আশায়। শুধু একটা, দুটো পছন্দের বই কেনার আশায়। আবার ছোটখাটো স্টলেও তো ভিড় কম নয়। লিটল ম্যাগের স্টলগুলোতেই বা এত ভিড় কেন? এই ছবিগুলোই তো এই আকালেও স্বপ্ন দেখায়।

INTERNATIONAL
KOLKATA
BOOK
FAIR
Publishers & Booksellers Guild

মহাকুম্ভ নয়, দাদু–নাতিতে বইমেলায়

সুরঞ্জন পাত্র

এবার যেন কুম্ভ মেলায় যাওয়ার হিড়িক পড়েছে। বারো বছর পর পূর্ণকুম্ভ বলে কথা। তার ওপর এবার নাকি মহাকুম্ভ। ১৪৪ বছর পর নাকি এমন মহাকুম্ভ দেখা যাবে। বেশ কয়েক মাস ধরেই এরকম একটা প্রচার চলছে। নতুন নতুন ট্রেন দেওয়া হয়েছে। রাস্তায়, চায়ের দোকানে— সব জায়গায় দেখছি, কুম্ভ নিয়েই আলোচনা। কে ট্রেনে টিকিট পেয়েছে, কে পায়নি, কে কোথায় গিয়ে ডুব দেবে, তা নিয়ে সবাই চর্চায় মশগুল।

মাঝে মাঝে ভাবি, আমার দেশটা হঠাৎ করে এত ধার্মিক হয়ে গেল কীভাবে? যাঁরা ধর্ম মানেন, বিশ্বাস করেন, তাঁরা নিশ্চয় যাবেন। পূর্ণকুম্ভ হোক বা অর্ধকুম্ভ, আগেও অনেকে গেছেন। তাঁদের কাছে গল্প শুনেছি। সমরেশ বসুর ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’ নিয়ে যে সিনেমা হয়েছে, সেটাও দেখেছি। কিন্তু এবারের মতো এমন মাতামাতি আগে কখনও দেখিনি। আমার অবশ্য কুম্ভে যাওয়ার বয়স নেই। সেই ইচ্ছেও নেই। আমি গিয়েছিলাম আমার তীর্থক্ষেত্রে, অর্থাৎ

বইমেলায়। করুণাময়ীর বইমেলাই হয়ে উঠল আমাদের মহাকুম্ভ।

গতবছরও বইমেলার দিনগুলোয় টিভি চ্যানেলগুলো মেতে ছিল অযোধ্যার রাম মন্দির নিয়ে। মনে হচ্ছিল, দেশে যেন আর কোনও সমস্যাই নেই। যেন একটা মন্দিরই দেশের উন্নতির সোপান। যেন এই মন্দিরটা হয়ে গেলেই সারা বিশ্ব ভারতের নামে ধন্য ধন্য রব তুলবে। সেটা ছিল ভোটের বছর। তাই সেই হাওয়া তোলার একটা মরিয়া চেষ্টাও ছিল।

আমি বাপু নাস্তিক মানুষ। এতসব ধর্মকর্ম বুঝি না। ধর্মকে নিয়ে যদি কেউ বাণিজ্য করে, তখন তা থেকে আরও দূরে পালাই। এটুকু বুঝি, এই লোকটি ধার্মিকও নয়। এবার কুম্ভ নিয়ে যা হল, তার পেছনে কতটা স্বতস্ফূর্ত আবেগ আর কতটা সরকারি ইভেন্ট, বেশ সংশয় আছে। অনেক হল ধর্মচর্চা। আমার তাহলে করণীয় কী? ঠিক করে নিলাম, কুম্ভে কী হচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাব না। টিভি দেখব না। যাঁরা এতে মেতে আছে, মেতে থাকুক। আমি ঠিক করলাম, বইমেলায় যাব। আমি থাকি মফস্বলে। এখান থেকে শিয়ালদা প্রায় একঘণ্টার পথ। যাওয়ার সময় তেমন সমস্যা নেই। কিন্তু ফেরার সময় বিস্তর ভিড়। তাছাড়া, বয়সটাও তো বাড়ছে। তবু ঠিক করে নিলাম, বইমেলাই যাব। সঙ্গে নিলাম দশ বছরের নাতিকে। শুধু নিজে টিভির ওই কুম্ভ-প্লাবন থেকে দূরে থাকলেই হবে না। মনে হল, ছোট্ট নাতিটাকেও এর থেকে দূরে রাখা দরকার।

দাদু-নাতি দুই ভাই মিলে চলে গেলাম মেলায়। আহ, যেন তাজা এক অক্সিজেন। আমার নাতিটি একটু ভোজনরসিক। বইয়ের থেকে খাবারের প্রতি একটু বেশি ঝোঁক থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই শুরুতেই মনে হল, ওর পেটটা আগে ঠান্ডা করা দরকার। নিয়ে গেলাম ফুড স্টলে। ওর পছন্দমতো জিনিস কেনা হল। আমিও সঙ্গ দিলাম।

ব্যাস, এবার তাহলে যাওয়া যাক বইয়ের সমুদ্রে। নিয়ে গেলাম দেব সাহিত্য কুটীরে। চাইছিলাম, ও কোনও একটা বই পছন্দ করুক। দেখলাম, এটা-সেটা নেড়েচেড়ে দেখছে। শেষমেশ লীলা মজুমদার আর অন্নদাশঙ্কর রায়ের বই পছন্দ হল। অন্য একটা স্টলে গিয়ে ভ্রমণের ওপর একটা বই কিনতে চাইল। আরও একটা স্টলে গিয়ে খেলার দুটো বই। ফাঁকে ফাঁকে আমিও টুকটাক কিছু কিনে ফেললাম। আমার প্রিয় লেখক বিভূতিভূষণ। তাঁর প্রায় সব বই-ই পড়া। তবু বইমেলায় নতুন নতুন আঙ্গিকে বিভিন্ন প্রকাশক বিভূতিভূষণকে হাজির করেন। সেগুলো কিনব না! নতুন বই না হয় আরও একবার পড়ব! তাছাড়া, আমি অনেককেই বই উপহার দিই। কাউকে না হয় উপহার হিসেবেই দেওয়া যাবে।

সেলিব্রিটি দর্শনও কম হল না। আমি আবার সবাইকে ঠিকঠাক চিনি না। নাতি দেখলাম, অনেককেই চিনতে পারল। কয়েকজনের কাছে গিয়ে সেলফিও তুলল। সে তুলুক। ওর কাছে এই স্মৃতিটা থেকে যাবে। তাছাড়া, ঘরে থাকলে কীই বা করত! তার থেকে বইমেলার এই ভিড়, এই বইয়ের সমুদ্র দেখা অনেক ভাল।

না, আমরা দাদু-নাতি কুম্ভের উন্মাদনায় মাতিনি। আমরা গিয়েছিলাম বইমেলায়। হ্যাঁ, এটাই আমাদের প্রতিবাদ।

পড়া আর শোনা দিব্যি মিশে গেছে

মলয় সেন

বইমেলা মানেই বইয়ের সমুদ্র। একেক স্টলে হাজার হাজার বই। ক্রেতারা এসে লাইন দিয়ে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। পরের দিন আবার হাজির হয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন বই। সবমিলিয়ে বইয়ের সংখ্যা কত? কোটি ছাপিয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, মানুষ যে এত বই নিয়ে যাচ্ছেন, আদৌ কি সেগুলো পড়া হয়! নিশ্চিতভাবেই যত বই কেনা হয়, তার অর্ধেকও পড়া হয় না। এটা শুধু এখনকার কথা নয়। পঞ্চাশ বছর আগেও পরিসংখ্যানটাও এমনই ছিল। মানুষ বই পড়ছে না, এই আক্ষেপ বহুকাল আগে থেকেই শুনে আসছি। লক্ষ লক্ষ বই বিক্রির পরেও এই অভিযোগ থাকবে। এটা নিয়ে গেল গেল রব তোলার কিছু নেই। হাহুতাশ করারও কিছু নেই।

বরং, আশার আলো ছড়িয়ে আছে দিতে দিকে। গত কয়েক বছরে পড়ার ছবিটাই যেন বদলে গেছে। প্রযুক্তি নানা দরজা খুলে দিয়েছে। প্রথমত, এখন বাঙালির বই কেনা আর শুধু বইমেলা নির্ভর নয়, এমনকী কলেজ স্ট্রিট নির্ভরও নয়। অনলাইনে সারা বছরই বই পাওয়া যায়। ঘরে বসেই অর্ডার দেওয়া যায়। ঘরে বসেই পাওয়াও যায়।

HUMAN FIGURE

সারাবছরই এই কেনাকাটা চলছে।

পিডিএফ বইয়ের রমরমা অনেকটাই বেড়েছে। বিভিন্ন অ্যাপে, সাইটে, হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে যাচ্ছে সেই পিডিএফ বই। যে যার সময়মতো ডাউনলোড করছেন। পড়ছেন। ভাল লাগলে শেয়ারও করছেন। বইয়ের ব্যবসা এতে কতখানি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, বলা মুশকিল। তবে বইয়ের বিস্তার যে অনেক বেড়েছে, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এবার অডিও বুক। অন্তত এক্ষেত্রে লকডাউন এক বিশাল আশীর্বাদ। এই কয়েক বছরে কত লক্ষ লক্ষ অডিও বুক তৈরি হয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই। ইউটিউবে গল্প, উপন্যাস পাঠ। লক্ষ লক্ষ ভিউয়ার। যাঁরা হয়ত হাতে বই নিয়ে পড়তেন না, তাঁরা বাসে বা ট্রেনে যেতে যেতেও দিব্যি শুনে নিচ্ছেন পছন্দের গল্প, উপন্যাস। তাঁরা হয়তো প্রত্যক্ষ পাঠক নন। কিন্তু পরোক্ষ পাঠক তো বলাই যায়। এই ইউডিউব আর অডিও বুকের হাত ধরে যদি বাংলা সাহিত্যে কানের মধ্যে দিয়ে মনে ঢুকে পড়ে, মন্দ কী?

তাই, আজকের দিনে বই আর শুধু বইয়ে সীমাবদ্ধ নেই। সে তার নিজের মতো করে ছড়িয়ে পড়েছে। পড়া আর শোনা মিশে গিয়ে তৈরি হয়েছে বিরাট এক ক্যানভাস। এই ক্যানভাস আরও প্রসারিত হোক। পড়া আর শোনার এই মেলবন্ধন বাংলা সাহিত্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাক।

বাংলাদেশ নেই, দীর্ঘশ্বাস আছে

সৃজন শীল

এবারের বইমেলায় সব আছে। কিন্তু কিছু একটা নেই। তা হল বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন। পেরু, চিলি, স্পেন, আর্জেন্টিনা— একের পর এক দেশের জায়গা হয়েছে। ব্রাত্য শুধু বাংলাদেশ। এটা ঘটনা, এখন পরিস্থিতি অনুকূল নয়। বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, এই দেশেও তার আঁচ এসে পড়েছে। এমনকী সাহিত্যের আঙিনাও কিছুটা যেন কলুষিত হয়েছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশের স্টল থাকলে কেউ কেউ হয়তো সস্তা প্রচার পাওয়ার নেশায় সেখানে ঝামেলা করত। আর আমাদের চ্যানেলগুলি দিনভর তা দেখিয়েও যেত। হয়তো সেই পরিস্থিতি আঁচ করেই গিল্ড সেই ঝুঁকি নেয়নি। প্রশাসনও হয়তো অপ্রীতিকর পরিস্থিতিকে ডেকে আনতে চায়নি। সেদিক থেকে বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন না থাকার সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু পাশাপাশি, মৌলবাদিদের হুমকির কাছে আমরা সবাই কম বেশি নতজানু, এটাও বোঝা গেল। বাংলাদেশের মানুষকে ভারত–বিরোধী হিসেবে দেখানোর একটা চেষ্টা আমাদের চ্যানেলগুলি করে চলেছে। কিন্তু

মাওলা ব্রাদার্স
অন্যপ্রকাশ

ভারতের সাহিত্য সম্পর্কে বাংলাদেশের আম নাগরিকের মনোভাবটা ঠিক কেমন?

একেকজনের ভালবাসার ক্ষেত্র একেকরকম। যিনি রাজনীতি ভালবাসেন, তিনি সবকিছুকে রাজনীতির মোড়কে দেখতে চান। যিনি খেলা ভালবাসেন, তিনি টিভি বা ইউটিউবে খেলার ভিডিওই বেশি করে দেখেন। যিনি গানবাজনা ভালবাসেন, তিনি সঙ্গীতশিল্পীদের কথাই শুনতে চান।

ঠিক তেমনই, আমি একজন শিক্ষক। ছোট থেকেই সাহিত্য মনস্ক। তাই আমার দিনের একটা বড় অংশ সাহিত্যের আঙিনাতেই কাটে। আমার কাছে বাংলাদেশ মানে শেখ হাসিনা বা মহম্মদ ইউনূসের দেশ নয়। আমার কাছে বাংলাদেশ হল শামসুর রহমান, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহাদের দেশ। আমার কাছে বাংলাদেশ হল আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হুমায়ুন আহমেদের দেশ।

একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। স্মার্টফোন আসার পর খুব ইচ্ছে হত, ইন্টারনেটে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের ইন্টারভিউ শুনব। এপার বাংলার বিভিন্ন সাহিত্যিকদের নাম ধরে সার্চ মারতাম। বেশিরভাগ লিঙ্ক আসত বাংলাদেশের। অর্থাৎ, সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়দের মতো দিকপাল সাহিত্যিকরা যখন বাংলাদেশে গেছেন, সেখানকার কোনও প্রথমসারির চ্যানেল তাঁদের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছে। প্রাইম টাইমে খুব গুরুত্ব দিয়ে সেগুলো প্রচার করেছে।

ছবিটা যে এখনও খুব বদলেছে, এমন নয়। মনে করে দেখুন তো, আমাদের রাজ্যের যেগুলো মূলস্রোত চ্যানেল, সেখানে এইসব দিকপাল মানুষদের সাক্ষাৎকার কবার দেখেছেন? কেউ মারা গেলে, ফোনে ধরে কয়েক লাইনের প্রতিক্রিয়া। কোনও একটা বিষয় নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে, তখন

হয়তো কোনও সাহিত্যিকের দু-চার লাইন বাইট। ভাগ্যিস, সাহিত্যমনস্ক কিছু ইউটিউব চ্যানেল আছে। যাঁরা সীমিত সামর্থ্য নিয়েও সাহিত্যের, সাহিত্যিকদের কথা তুলে ধরছে। কিন্তু মূলস্রোত মিডিয়া! আমাদের বরেণ্য সাহিত্যিকদের আমরা কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছি? কিন্তু বাংলাদেশের আমজনতা তাঁদের মাথায় করে রেখেছে। আমাদের সাহিত্যিকদের যে শ্রদ্ধার চোখে সেই দেশে দেখা হয়, আমরা কি আদৌ ওপার বাংলার সাহিত্যিকদের সেই শ্রদ্ধার চোখে দেখি? ওপার বাংলার মানুষ যতখানি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা সমরেশ মজুমদারের লেখা পড়েছেন, এপার বাংলার মানুষ কি ততখানি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বা হুমায়ুন আহমেদকে পড়েছেন? সে দেশের কোনও সাহিত্যিক এ দেশে এলে, আমাদের মূলস্রোত চ্যানেলে কি তাঁর ইন্টারভিউ রেকর্ড করা হয়েছে? ও দেশের কথা ছেড়েই দিলাম, আমরা নিজেদের সাহিত্যিকদেরই মূল্য দিই না। প্রাইম টাইমে কোনও সাহিত্যিকের সাক্ষাৎকার দেখানো হচ্ছে, এমনটা ভাবতেই পারি না। এখনও যে কোনও সাহিত্যিকের নাম ধরে সার্চ করুন। বাংলাদেশের লিঙ্কই বেশি পাবেন।

আচ্ছা, সে দেশের চ্যানেলে আমাদের সাহিত্যিককে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন? কারণ, সে দেশের দর্শক তাই চান। ও দেশের মানুষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা সমরেশ মজুমদারের একটা ইন্টারভিউ দেখার সুযোগ পেলে অন্য সব হাতছানিকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। এই কারণেই সে দেশের প্রথমসারির চ্যানেলগুলিও আমাদের সাহিত্যিকদের এই সম্মান দেখিয়ে থাকে।

অথচ, নাম কে ওয়াস্তে কয়েকটা লোকের ফেসবুক পোস্ট দেখে আমরা কী অবলীলায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলাম যে, বাংলাদেশের লোকেরা ভারতকে সহ্য করতে পারে না। একশ্রেণির বিকৃত মনের উন্মাদ সব দেশেই থাকে। তাঁদের সেই হুঙ্কারকে আমরা সেই দেশের আমজনতার কণ্ঠস্বর হিসেবে ধরে নিচ্ছি। এ যে আমাদের কতবড় অজ্ঞতা, তা আমরা বুঝতেও পারছি না। দুই দেশের সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যকে কেমন বিষিয়ে চলেছি। এই সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আবহ নির্মাণ হতে বছরের পর বছর লেগেছে। কিন্তু তাকে নষ্ট করতে আমরা কত মরিয়া! আমাদের চ্যানেলগুলি নাকি দেশকে দারুণ ভালবাসে। তাহলে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়দের সাক্ষাৎকার খুঁজতে বাংলাদেশের চ্যানেল দেখতে হয় কেন?

বিভেদকামীদের প্ররোচনা সরিয়ে আবার সাহিত্যের আঙিনায় সম্প্রীতি ফিরে আসুক। স্বমহিমায় ফিরে আসুক বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন। বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন ছাড়া কলকাতা বইমেলা অসম্পূর্ণ।

বইকে চৈত্র সেলের প্রোডাক্ট বানাবেন না

উত্তম জানা

বইমেলা এলেই একটা কথা হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। কোন স্টলে ডিসকাউন্ট কত? কেউ কেউ বলেন, কলেজ স্ট্রিটে কুড়ি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেয়, বইমেলায় দশ কেন হবে? মোদ্দা কথা, বইমেলায় ডিসকাউন্ট বাড়াতে হবে।

আসলে, কেউ কেউ বইকেও চৈত্রসেলের জামাকাপড়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। সোশ্যাল মিডিয়া আসার পর আজগুবি সব দাবি যেন বেড়ে গেছে। বই সংক্রান্ত নানা গ্রুপ রয়েছে। সেইসব গ্রুপে কিছু মননশীল পাঠক নিশ্চয় আছেন। কিন্তু সেইসব গ্রুপের অধিকাংশ সদস্যের আলোচনা দেখে মনে হয়, বইয়ের সঙ্গে এঁদের বিশেষ সদ্ভাব নেই। রান্নার গ্রুপেও আছেন, বেড়ানোর গ্রুপেও আছেন, বইয়ের গ্রুপেও না থাকলে প্রেস্টিজ থাকে না। আর গ্রুপগুলিও সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এইসব লোকেদের যুক্ত করে। এতে সেইসব গ্রুপের আসল উদ্দেশ্যটাই ব্যহত হয়। বই নিয়ে সুস্থ ও গঠনমূলক আলোচনা গৌণই থেকে যায়।

এঁদের আলোচনা শুনলে মনে হয়, একটু ডিসকাউন্ট বাড়িয়ে দিলেই এঁরা বুঝি বই

কিনে আলমারি ভর্তি করে ফেলবেন। নেহাত ডিসকাউন্ট কম বলে কিনতে পারছেন না। স্বাভাবিক যুক্তি বলে, ডিসকাউন্ট বেশি থাকলে যিনি দশটা বই কিনতেন, কম থাকলে তিনি পাঁচটা তো কিনবেন। কিন্তু সারা বছরে হয়তো একটা বইও পড়েননি। অথচ, মতামত দেওয়ার বেলায় দারুণ সক্রিয়।

আসলে, এইসব ভুয়ো পাঠকদের জন্য ভুগতে হচ্ছে সত্যিকারের পাঠকদের। কোনও কোনও প্রকাশন সংস্থা বইয়ের দাম দ্বিগুণ/তিনগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ধরা যাক, তিন বছর আগেও যে বইয়ের দাম ছিল দুশো টাকা, সেই বইয়ের নতুন প্রিন্টে হঠাৎ দেখা যাচ্ছে পাঁচশো টাকা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দাম বাড়বে, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে আড়াই গুণ! পাঁচশো টাকা দাম রেখে যদি কেউ পঁচিশ শতাংশ ছাড় দেয়, তাহলে মূল্য দাঁড়ায় ৩৭৫। আর আড়াইশো টাকার বইয়ে যদি দশ পার্সেন্ট ছাড় দেওয়া হয়, তাহলে দাম দাঁড়ায় ২২৫। তাহলে কোনটা বেশি হল?

যিনি ৩৭৫ টাকা দিয়ে কিনলেন, তিনি ভাবলেন ২৫ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পেলাম। আর যিনি ২২৫ টাকা দিয়ে কিনলেন, তিনি ভাবলেন, মাত্র দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পেলাম। মাঝখান থেকে ভুগতে হয় সত্যিকারের বইপ্রেমী মানুষদের। তাঁদের ২২৫ টাকার বই ৩৭৫ টাকায় কিনতে হয়।

তাই দোহাই, বইকে চৈত্র সেলের পর্যায়ে নামিয়ে আনবেন না। ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট করে চিৎকার করে দুশোর বইকে পাঁচশো টাকায় নিয়ে যাবেন না।

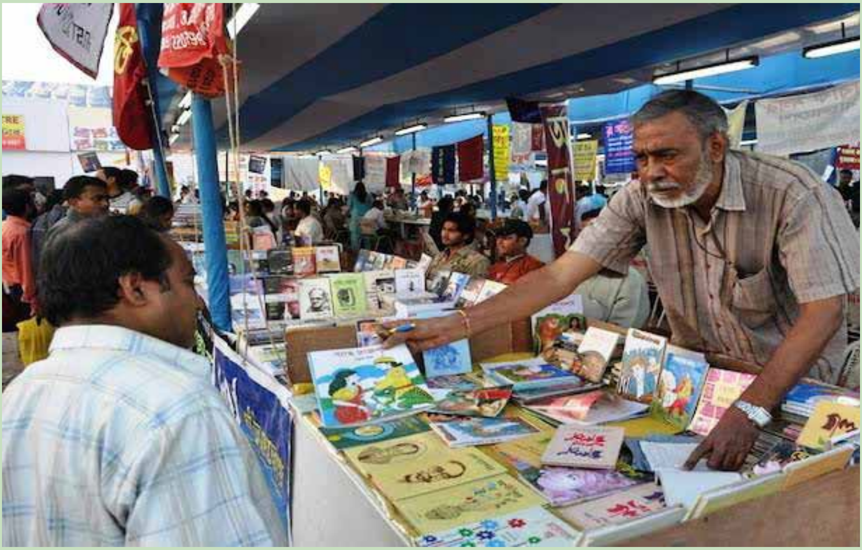

আমার ঠিকানা ওই লিটল ম্যাগাজিনের প্যাভিলিয়ন

সুকর্ণ সিনহা

এখন সারা বছরই বইমেলা। নানারকম সাইট দেখুন। ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপ দেখুন। ইচ্ছেমতো অর্ডার দিন। ঘরে বই পৌঁছে যাবে। তাই বলে কি আর বইমেলার আকর্ষণ কমে! এত এত মানুষের সমাগম দেখলে সত্যিই মন ভাল হয়ে যায়। মনে হয়, পৃথিবীতে এখনও সুস্থ চিন্তা করার লোক আছে।

বিভিন্ন স্টলে লোকেরা বই নেড়েচেড়ে দেখছেন। যে যাঁর পছন্দমতো বই কিনছেন। এর থেকে ভাল দৃশ্য আর কী হতে পারে! তবে এই বইমেলায় আমার আকর্ষণ একটু অন্যরকম। আমি বেশিরভাগ সময় কাটাই লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নে।

কলেজে পড়ার সময় কয়েকজন বন্ধু মিলে

লিটল ম্যাগাজিনের ভূত চেপেছিল। যতদূর মনে পড়ে, গোটা দশেক সংখ্যা বের করেছিলাম। বিভিন্ন দিকপাল লেখকদের বাড়িতে ছুটেছিলাম লেখা আনতে। অনেকেই দিয়েছিলেন। অনেকে সময়ের অভাবে হয়ত দিতে পারেননি। আবার তখনকার অনেক উঠতি কবি, লেখাকের কাছ থেকেও লেখা নিয়েছিলাম। ভাবতে ভাল লাগে, আজ তাঁরা স্বনামধন্য। আজ বড় বড় প্রকাশকের ঘর থেকে তাঁদের বই বেরোয়। তাঁদের বই থেকে সিনেমা হয়।

তারপর যা হয়! কাজের সন্ধানে যে যার মতো নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল। নিজেদের মধ্যে ছোট খাটো ভুল বোঝাবুঝিও হল। সবমিলিয়ে উৎসাহে ভাটা পড়ল। নাম কে ওয়াস্তে দু একটা সংখ্যা বেরোলো। তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই সেই ম্যাগাজিন একসময় ‘প্রাক্তন’ হয়ে গেল। এখনও আমার বাড়িতে সেই পুরনো সংখ্যাগুলো যত্ন করে সাজানো। এখন নানা পত্রপত্রিকায় টুকটাক লিখি। কিন্তু নিজেদের হাতে ম্যাগাজিন তৈরি করার যে আনন্দ, সেই রোমাঞ্চ এখনও যেন তাড়া করে।

নিজেরা লিটল ম্যাগাজিন করেছিলাম বলেই সেই আবেগটা আজও বুঝতে পারি। তাই বইমেলায় ওই স্টলগুলোতেই ঘুরঘুর করি। অনেক চেনামুখ। কারও বয়স পঞ্চাশ, তো কারও সত্তর। অনেকেই নিজের পকেট থেকেই বিরাট এই খরচ বহন করেন। অনেকে পেনশনের টাকার অনেকটা তুলে রাখেন ম্যাগাজিনের জন্য। অনেকের আবার ছেলে-মেয়ের প্রবল আপত্তি বাবা যেন বইমেলায় ওই লিটল ম্যাগাজিনের স্টলে না বসে। এতে নাকি তাদের মানসম্মান থাকে না। কেউ আবার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে মেলায় আসেন। বই বিক্রি করেন।

মনে হতেই পারে, এঁরা কেন আসেন! কত টাকাই বা উঠে আসে! লোকে উল্টে পাল্টে দেখে। চলে যায়। অনেকে তো এদিকের ছায়াও মাড়ায় না। অনেকে আবার বলে, না বাবা, লিটল ম্যাগাজিনের দিকে যাব না। চেনা জানা কারও সঙ্গে দেখা হলেই বই গছিয়ে দেবে। এই লিটল ম্যাগ প্যাভিলিয়নের কাছেই থাকে ফুড পার্ক। খাবারের স্টলে নিমেশে লক্ষ লক্ষ টাকার বাণিজ্য হচ্ছে। অথচ, এদিকটায় কেউ ফিরেও তাকায় না।

এবার একটা জিনিস খুব ভাল লাগল। এই লিটল ম্যাগাজিনের প্যাভিলিয়ন সন্দীপ দত্তর নামাঙ্কিত। সত্যিই মনটা আনন্দে ভরে গেল। দু’বছর আগেও এই লোকটাকে এই প্যাভিলিয়নে দেখেছি। একটা টুল নিয়ে বসে থাকতেন। প্রায় চার দশক ধরে মানুষটা বাংলার নানা প্রান্ত থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনকে সংগ্রহে রেখেছেন। কত গবেষককে

তাঁদের গবেষণায় সাহায্য করেছেন। এমনও হয়েছে, যাঁরা একসময় পত্রিকা বের করতেন, তাঁদের কাছে পুরনো সংখ্যা নেই। অথচ, সন্দীপবাবুর কাছে সেই সংখ্যা ছিল। টুকরো টুকরো কত ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। এমন একটা মানুষকে গিল্ড যে এবার অনন্য সম্মান দিল, সত্যিই ভাল লাগছে। অন্তত এই কারণে, গিল্ডকে ধন্যবাদ দেওয়াই যায়।

এই লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নও আসলে একটা সমুদ্র। কত বিষয় সম্ভার। কত নানা ধরনের ভাবনার সংকলন। বড় বড় প্রকাশনা সংস্থা হয়তো এসব নিয়ে বই করার সাহসই দেখাবে না। কারণ, এসব বইয়ের বাজার নেই। কিন্তু এই লিটল ম্যাগের লোকগুলো নাছোড়বান্দা। তাঁরা ভাল করেই জানেন, কেউ পড়বে না। টাকা উঠে এল কিনা, তাঁরা পরোয়াও করেন না। তাঁদের যা ভাল লাগে, তাঁরা তাই করেন। এই আনন্দ তাঁদের কাছ থেকে কে কেড়ে নেবে! সব বই কিনতে পারি না ঠিকই। কিন্তু বিভিন্ন স্টল ঘুরে বইগুলো দেখতে তো পারি। যেটা আজ কিনলাম না, সেটা হয়ত পরশু কিনে নিলাম। যেটা গত বছর কিনতে পারিনি, সেটা হয়ত এবছর কিনলাম।

এই প্রজন্ম নাকি বইবিমুখ। কিন্তু ওই স্টলে তো অনেক কমবয়সী ছেলেকেও দেখছি। তারা নানা বিষয় নিয়ে বই করছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে যার মতো করে প্রোমোশন করছে। নামী লেখকদের লেখা আনছে। কেউ কেউ আবার পারিশ্রমিকও দিচ্ছে। কেউ কেউ দেখলাম, স্টল থেকেই বিভিন্ন প্রবাসী বন্ধুদের ফোন করছে। ঠিকানা চাইছে। বলছে, গুগল পে-তে টাকা পাঠিয়ে দাও, কুরিয়রে বই চলে যাবে। এদের নাছোড়বান্দা আবদারে ইচ্ছে না থাকলেও অনেকে সাড়া দিচ্ছেন। মাঝবয়সে এসে তারুণ্যের এই জোয়ার দেখে বেশ ভালই লাগে। নিজের পুরনো দিনগুলোয় যেন ফিরে যাই।

ভাগ্যিস বিদেশিরা বাংলা পড়তে পারেন না

প্রায় বাইশ বছর আগের কথা। বইমেলার শেষদিন। একটি ছবি ও তার অভিনব একটি ক্যাপশন। সেই মজার ঘটনার স্মৃতিচারণ করলেন সরল বিশ্বাস।।

বইমেলার শেষদিন বলতেই বাইশ বছর আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে যায়। বেশি ভূমিকায় না গিয়ে সরাসরি বিষয়ে ঢুকে পড়া যাক। এই প্রতিবেদক তখন সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় টুকটাক ফ্রিল্যান্স করতাম। কোথাও পারিশ্রমিক পাওয়া যেত। অধিকাংশ জায়গাতেই ফ্রিতে লেখালেখি।

তখনকার সময়ের এক জনপ্রিয় সাপ্তাহিক। ঠিক হল, বইমেলার বারোদিন রোজ কাগজ বেরোবে। দুপুরের মধ্যে ছাপা হয়ে যাবে। দুপুরেই হকার সোজা বইমেলায় চলে যাবে। যা বিক্রি হবে, মূলত বইমেলায়। রাজনীতি, খেলা, সিনেমা–সব ধরনের খবরই থাকত। তবে বেশিরভাগ খবর ও প্রতিবেদন ও ছবি থাকত বইমেলা সংক্রান্ত। বেশিরভাগ দিনই লিড স্টোরি আমিই লিখতাম। আগেরদিনেই অনেক সময় লিখে রাখা হত। কম্পোজ হয়ে থাকত।

শেষদিন। সেদিনেরও লিড স্টোরি লেখার দায়িত্ব আমার উপর। শেষদিন মানে, কেমন একটা মন খারাপের ব্যাপার। এতদিনের এত ব্যস্ততা, বইপ্রেমীদের এই উৎসব, সব যেন অতীত হয়ে যাবে। বিদায় বেলার একটা করুণ সুর যেন বেজে উঠবে। মূলত এইরকম আবেগের ছোঁয়া দিয়েই লিড স্টোরিটা লেখা হয়েছিল। আগের রাতেই বাড়ি থেকে লিখে ফেলেছিলাম। সকালে সেটা প্রেসে যাবে।

সম্পাদক মশাই লেখাটা পড়লেন। বললেন, খুব ভাল হয়েছে। তবে অ্যাঙ্গেলটা একটু বদলে দে। কী অ্যাঙ্গেল করব? উনি নিজেই ঠিক করে দিলেন। শেষদিন, রবিবার। রেকর্ড ভিড় হবে। রেকর্ড ভিড় মানেই রেকর্ড বই চুরি। তাই শেষদিন বই চুরির আতঙ্কে ভুগছে প্রকাশকরা। এই অ্যাঙ্গেলে লেখাটা হবে। হাতে অল্প সময়। চটপট কয়েকজন প্রকাশককে ফোনে ধরা হল। অন্যান্যবার কী রকম বই চুরি হয়, এবার কী রকম চুরি হচ্ছে? কোন ধরনের বই বেশি চুরি হয়? অন্যান্য চোরদের সঙ্গে বইচোরদের তফাত কোথায়? এদের ‘পবিত্র পাপি’ বলা যায় কিনা? মূলত কোন বয়সের লোকেরা বেশি

বই চুরি করে? কেন চুরি করে? পড়ার জন্য নাকি বিক্রি করার জন্য, নাকি বন্ধুদের কাছে সস্তা ক্রেডিট নেওয়ার জন্য? ধরা পড়লে তাদের কী ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়? পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় নাকি ধমক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়? এই জাতীয় নানারকমের প্রশ্ন করা হল। দারুণ দারুণ সব উত্তর উঠে এল।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে যুদ্ধ। দ্রুত লেখাটা লিখে ফেললাম। এডিটর মশাই চোখ বুলিয়ে বললেন, ‘ভাল হয়েছে। এটাই চেয়েছিলাম। এই লেখাটা দারুণ হিট হবে।’ লেখাটা কম্পোজে চলে গেল। এবার ছবি বাছার কাজ শুরু। ছোট কাগজ। হাতে বেশি ছবি ছিল না। তখন গুগলে এসব ছবি পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। একদিন একজন ফটোগ্রাফার গিয়ে বেশ কয়েকটা ছবি তুলে এনেছিল। সেই ছবিগুলোই একেকদিন একেকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছাপা হত। যেগুলো বের করা হল, সবগুলোই আগের কয়েকদিনে ছাপা হয়ে গেছে। একটা ছবি ছাপা হয়নি। সেটা হল, একটি স্টলে কয়েকজন বিদেশি পর্যটক বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।

সম্পাদক মশাই সেই ছবিটাই পাঠিয়ে দিলেন স্ক্যান করতে। মনে খটকা লাগল, এই লেখার সঙ্গে এই ছবির কী সম্পর্ক? সেই খটকার কথা সম্পাদক মশাইকে জানালাম। তিনি খুব একটা পাত্তা দিলেন না। বললেন, বই চুরির তো ছবি হয় না। যা হোক কিছু একটা ছবি দিলেই হবে। কিন্তু মনটা তখনও খচখচ করছে। এই যে লেখা, তার সঙ্গে এই ছবির কী সম্পর্ক? ছবিটাকে তো জাস্টিফাই করতে হবে। এর ক্যাপশানই বা কী হবে?

ছবি স্ক্যান হয়ে এল। সম্পাদক মশাই তার তলায় ক্যাপশান করলেন— বই চুরিতে পিছিয়ে নেই বিদেশিরাও।

ভেবে দেখুন, কোন কপির সঙ্গে কোন ছবি! তার সঙ্গে কী অসাধারণ একটা ক্যাপশন। ভাগ্যিস, বিদেশিরা বাংলা পড়তে পারে না।

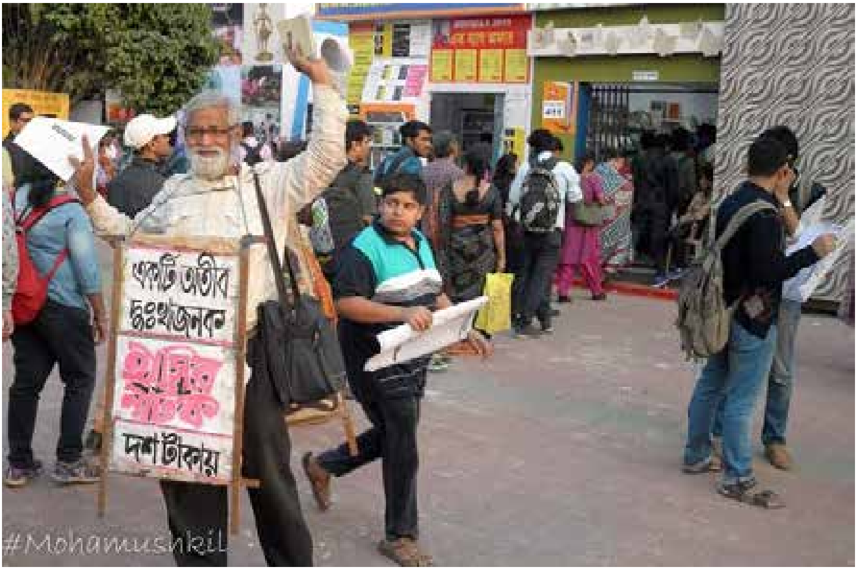

গোটা বইমেলা চত্বরই তাঁর স্টল

নিজের পত্রিকা নিজেই ফেরি করে বেড়ান। হাসিমুখে অন্যদের হাসিয়ে যান। এমনই এক চরিত্রকে তুলে ধরলেন পারিজাত সেন।

বিরাট বইমেলায় তাঁর কোনও স্টল নেই। আসলে, গোটা বইমেলা চত্বরই তাঁর স্টল। একমুখ দাড়ি। বুকে ও পিঠে ঝোলানো লম্বা পোস্টার। দুহাতে অসংখ্য ছোট ছোট বই। দু'হাত তুলে তিনি হেঁকে চলেছেন— মাত্র পাঁচ টাকা। পড়বেন কুড়ি মিনিট। হাসবেন একঘণ্টা। পড়া শুরু হবে, হাসি শুরু হবে। পড়া থামবে, হাসি থামবে না।

কণ্ঠস্বরটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে! একটু স্মৃতি হাতড়ে পুরনো বইমেলাগুলোতে ফিরে যান। মুখটাও এবার নিশ্চয় মনে পড়ছে। হ্যাঁ, ইনি অলোক কুমার দত্ত। বইমেলার সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন সেই শুরু থেকেই। বড় সেলিব্রিটি নন, স্টল জুড়ে তাঁর বইয়ের সম্ভার নেই, তাঁর বই কিনতে লম্বা লাইন

পড়ে, এমনও নয়। কেউ কখনও তাঁর অটোগ্রাফ চেয়েছে কিনা, তা–ও জানা নেই। তবু তিনি সাহিতের ফেরিওয়ালা। বইমেলায় তিনিও স্বতন্ত্র এক চরিত্র।

হেঁকে হেঁকে বই বিক্রি করার অভ্যেসটা সেই ১৯৭৫ থেকে। প্রথম বইমেলা থেকেই জড়িয়ে গেছেন এই উৎসবের সঙ্গে। তাঁর কথাতেই শোনা যাক। শুরুর বইমেলার সময় আমার নিজের কোনও পত্রিকা ছিল না। আমার দাদা–কবিরা আর বন্ধুরা মিলে বের করত কণ্ঠস্বর। আমি হেঁকে হেঁকে বিক্রি করতাম। সবাই যে স্টলে এসে কিনে নিয়ে যাবে, এমন আশা করাও ঠিক নয়। তাই স্টলে বন্দি না থেকে গোটা মাঠ জুড়ে বিক্রি করাই ভাল। অনেক বেশি লোকের কাছে পৌঁছনো যায়। তারপর ১৯৮৭ নাগাদ চালু করলেন নিজের পত্রিকা স্বয়ংনিযুক্তি। শুরুতেই কবিতা সংখ্যা। তারপর করলেন হাসি সংখ্যা। হুড়হুড় করে সব বিক্রি হয়ে গেল। তৈরি হয়ে গেল সেই অভিনব স্লোগান। যা আজও প্রাণবন্ত। একই ক্যাপশন আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে মানুষকে আনন্দ দিচ্ছে, এটা অন্য দেশ হলে হয়ত ‘ক্যাপশন অফ দ্য ডিকেড’ বা অন্য কিছু পুরস্কার পেত।

হেঁকে হেঁকে বিক্রি করেন। অনেক চেনা মানুষের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হয়ে যায়। তখন সঙ্কোচ হয় না! বাংলা আকাদেমি চত্বরে দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, ‘কে যে কীসে লজ্জা পায় আর কে যে কীসে গর্ব অনুভব করে, তা বোঝা খুব মুশকিল। একজন মাতাল মদ খেয়ে রাস্তায় চিৎকার করতে করতে যায়। ভাবে সে বোধহয় দারুণ মূল্যবান কথা বলছে। অনেক বড় বড় মানুষও এমন কাজ করে, যা বেশ হাস্যকর। কিন্তু তারা ভাবে, তারা বুঝি দারুণ কিছু করছে। তাছাড়া, চুরি–ডাকাতি তো করছি না। নিজের পত্রিকা নিজে বিক্রি করি। লজ্জা পেতে যাব কেন? দাদাঠাকুরকে নিশ্চয় জানেন! তিনিও কিন্তু নিজের পত্রিকা নিজেই হেঁকে হেঁকে বিক্রি করতেন। তাঁর মতো মানুষ যদি পারেন, আমার প্রেস্টিজে লাগবে কেন? আমি নিশ্চয় তাঁর চেয়ে বড় নই। আমার অনেক পরিচিত লোক অবশ্য বলে, কেন ভাঁড়ের মতো বই নিয়ে চিৎকার করিস? আমি তাদের বলি, আমি ভাঁড় হতে পারি, ছোটলোক তো নই।

বইমেলা আসে, বইমেলা ফুরিয়েও যায়। বাকি সময়টা তাহলে কী করেন? আসলে, অলোকবাবু পেশায় কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। ছোট থেকেই আঁকার শখ। তাই ভর্তি হয়ে গেলেন ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে। আঁকার কাজের পাশাপাশি চলল আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক। না, কোনও তারকা কবির কবিতা নয়, কবিতা খুঁজে বের করেন লিটল ম্যাগ থেকে। আর তাঁর শ্রুতিনাটক কখনও উঠে আসে সতীনাথ মুখার্জি, কখনও দেবরাজ রায়ের কণ্ঠে। বিদেশেও বেশ কিছু জায়গায় অভিনয় হয়েছে তাঁর লেখা শ্রুতিনাটক। আর শীত এলেই মন ছুটে যায় বইমেলায়। শুধু কলকাতা বইমেলা নয়। বিভিন্ন জেলার বইমেলায় ঠিক পৌঁছে যান। পৌঁছে যান প্রতিবেশী রাজ্যেও।

কী রকম বিক্রি হয়? কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর ছুঁড়ে দিলেন পাল্টা রসিকতা, ‘কত লিখবেন? তার চেয়ে আপনি বরং লিখুন, ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলায় কে আর জড়াতে চায়?’

জয় গোস্বামীর থেকে ঋতুপর্ণার কদর বেশি!

একাকী দাঁড়িয়ে জয় গোস্বামী, কেউ চিনতেও পারছেন না। পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছেন ঋতুপর্ণা। তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার কী হুড়োহুড়ি! এ কোন বইমেলা? লিখলেন রাহুল বিশ্বাস।।

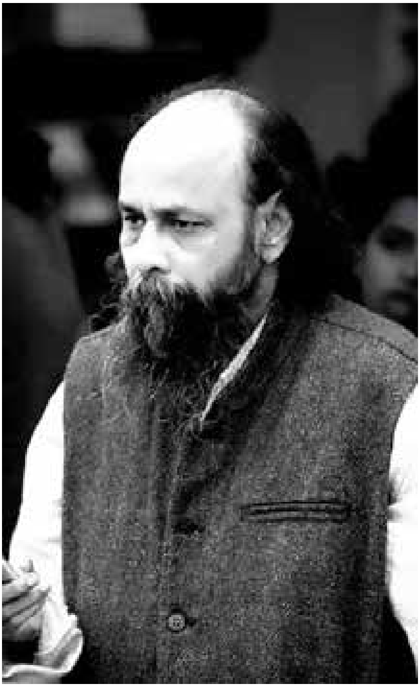

বইমেলা মানেই বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। সবটা যে খুব আনন্দ দিয়ে যায়, এমন নয়। এমন কিছু ঘটনা নজরে পড়ে যায়, যা হয়ত কাঙ্খিত ছিল না। বছর চারেক আগের একটি স্মৃতি তুলে ধরছি। অফিস ছুটির পর গেছি করুণাময়ীতে। তেমন ভিড় ছিল না। বইমেলা মানেই বিভিন্ন সাহিত্যিকের দেখা মিলবে, এ আর নতুন কথা কী? যখন থেকে বইমেলা আসছি, কত সাহিত্যিককে দেখার সুযোগ হয়েছে। তাঁদের ঘিরে কত ভিড়, কত সই শিকারির আবদার। কত ছবি তোলার আবদার। সেদিন একটু অন্যরকম ছবি। একটু দূরে একাকী দাঁড়িয়ে ছিলেন কবি জয় গোস্বামী।

যাঁরা হেঁটে যাচ্ছিলেন, অনেকেই তাঁকে চিনতেও পারলেন না। ভাবতে বেশ অবাকই লাগল। বইমেলায় এসেছে, অথচ জয় গোস্বামীকে চেনে না! এরা কারা? এরা বইমেলায় আসে কেন? আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে। দূর থেকে দেখে যাচ্ছি। টানা দশ–পনেরো মিনিট কাটল। একজনকেও দেখলাম না কবির সঙ্গে এগিয়ে এসে কথা বলছেন। একবার মনে হল যাই। গিয়ে নমস্কার করে আসি। পরে মনে হল, গিয়ে কীই বা বলব! বলব, আপনার কবিতা পড়েছি? এমন বোকা বোকা কথা শুনলে তিনি হয়ত বিরক্তই হবেন। কারণ, এমন কতা কয়েক লক্ষ বার শুনেছেন। তাছাড়া সত্যিই তো, কতটুকুই বা পড়েছি? তাঁর কটা বই কিনেছি? কটা কবিতা মুখস্থ বলতে পারি? আবৃত্তির সুবাদে বিখ্যাত হয়ে ওঠা কয়েকটা কবিতার কথা হয়ত জানি।

সেগুলো দাঁত কেলিয়ে বলতে যাওয়া মানে কবিকে বুঝিয়ে দেওয়া, যেটুকু শুনেছি আবৃত্তির দৌলতে। বই কিনে নয়।

এসব মনে মনে ভাবছি, হঠাৎ দেখলাম একটা ভিড় কবির পাশ দিয়ে চলে গেল। অন্তত পঞ্চাশ জনের ভিড়। কী ব্যাপার? কাকে ঘিরে এই ভিড়। দেখলাম গটগট করে হেঁটে চলেছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তাঁকে ঘিরে ছজন বাউন্সার। আর যা হয়! পেছন পেছন বিরাট একটা ভিড়। ঋতুপর্ণা কোন স্টলে যাচ্ছিলেন, কোন অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন, জানি না। কিন্তু তাঁকে ঘিরে এই আদেখলাপনা দেখে কিছুটা খারাপই লাগল। যাঁরা ঋতুপর্ণার পেছনে পেছন একটু ছবি তোলার জন্য ছুটে গেলেন, তাঁরা কেউ পাশে দাঁড়ানো জয় গোস্বামীর দিকে তাকিয়েও দেখলেন না। এমনকী স্বয়ং ঋতুপর্ণাও জয় গোস্বামীকে চিনতে পারলেন না। পারলেও এক সেকেন্ড দাঁড়ানোর সৌজন্য দেখালেন না।

এ কোন বইমেলা, যেখানে ঋতুপর্ণার পেছনে এমন ভিড়, অথচ জয় গোস্বামীকে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়! কেউ ফিরেও তাকায় না। কবি নিজেও তাকিয়ে রইলেন ভিড়ের দিকে। ভিড় চলে গেল। তিনি রাস্তার ধারে একাকী দাঁড়িয়েই রইলেন। কী ভাবছিলেন, মনে মনে কোনও কবিতা জন্ম নিচ্ছিল কিনা জানি না। হ্যাঁ, এই হুড়োহুড়ি, এই আদেখলাপনা—এটাই হয়ত মূলস্রোত বইমেলা। নির্বাক মুখ নিয়ে একাকী কবির দাঁড়িয়ে থাকা, এটাও বইমেলা।

বই তো কিনলেন, এবার?

নতুন বছরে বাঙালির নতুন পার্বণ— বইমেলা। দেখতে দেখতে শুরুও হয়ে গেল। স্বভাবতই বইপত্র নিয়ে আলোচনা চলবে। অনেকেই নতুন নতুন বই কিনবেন। একে একে পড়াও শুরু হয়ে যাবে। কোন বইটা কেমন লাগল? কী বিষয়বস্তু, চাইলে পাঠকদের সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারেন।

চাইলে বেঙ্গল টাইমসের মাধ্যমে সেই লেখককে খোলা চিঠিও লিখতে পারেন। আপনি লিখে পাঠান আপনার অভিজ্ঞতা। সংশ্লিষ্ঠ লেখকের কাছে সেই লেখার লিঙ্ক আমরা পৌঁছে দেব। তবে প্রথাগত বুক রিভিউ নয়। আপনি লিখুন একেবারেই আপনার নিজস্ব অনুভূতির কথা। অকারণ প্রশস্তি নয়, অকারণ আক্রমণও নয়। যা মনে হচ্ছে, তাই লিখুন।

শুধু যে নতুন বই নিয়েই আলোচনা, এমন নয়। বইটি হয়ত পাঁচ বছর আগের, কিন্তু আপনি নতুন কিনলেন, নতুন পড়লেন। সেই অভিজ্ঞতাও উঠে আসতে পারে। সার্বিকভাবে বইমেলার নানা গল্প ও অভিজ্ঞতাও উঠে আসতে পারে।

আপনার লেখা পাঠিয়ে দিন বেঙ্গল টাইমসের ঠিকানায়।

bengaltimes.in@gmail.com

প্রবাসের চিঠি

বইমেলা বললে সেই ময়দানকেই মনে পড়ে

বইমেলার সঙ্গে ময়দানের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে। সেটাই বইমেলার আদর্শ জায়গা। আবার সেখানেই ফিরিয়ে আনা হোক। মুম্বই থেকে এমনই দাবি তুললেন অরিত্র ঘোষাল।।

করোনার সময়টুকু বাদ দিলে করুণাময়ীই এখন বইমেলার স্থায়ী ঠিকানা। যদিও কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকার সুবাদে এই করুণাময়ীর বইমেলায় একবারও যাওয়া হয়নি। কিন্তু ভিনরাজ্যে থাকলেও মন পড়ে থাকে সেই বইমেলাতেই। কী বই বেরোচ্ছে, কোন বিষয়ে সেমিনার আছে, দূর থেকেই খোঁজ রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু বিশ্বাস করুণ, করুণাময়ীতে বইমেলা হচ্ছে, এই দৃশ্যটা মন থেকে এখনও ঠিক মানতে পারি না।

একজন বইপ্রেমী মানুষ হিসেবে মনে করি, ময়দানই হল বইমেলার আদর্শ জায়গা। বাঙালির আবেগের সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে ময়দান। ছোটবেলায় প্রথম গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে। পরের বছর গেলাম বন্ধুদের সঙ্গে। বাড়ি থেকে বাধা আসেনি। আমার বইমেলায় যাওয়াকে বাবা বেশ প্রশ্রয়ের চোখেই দেখতেন। কী কী বই কিনলাম, জানতে চাইতেন। কখনও কখনও তিনিও সেই বই পড়তেন।

আজ বাবাও নেই। কর্মসূত্রে আমিও বাংলার বাইরে। বইমেলারও ঠিকানা বদলে গেছে। ময়দান থেকে উচ্ছেদ হয়ে কয়েকবছর সে ঠাঁই নিয়েছিল মিলন মেলায়। পরে সেখান থেকে উঠে এসেছে সেন্ট্রাল পার্কে।

একবার বইমেলার সময় কলকাতা যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিন দিন ছিলাম। তিনদিনই মিলন মেলায় গিয়েছিলাম। কেন জানি না, মন থেকে ঠিক মেনে নিতে পারিনি। একটা কর্পোরেট কর্পোরেট ব্যাপার। সেই প্রাণটা যেন ছিল না। বইমেলা বলতেই চোখ বুজলে এখনও সেই ময়দানের কথাই মনে পড়ে। একটু ধুলো উড়ত। কেন জানি না, সেই ধুলো বেশ ভালই লাগত। ফেরার সময় পার্ক স্ট্রিট থেকে শিয়ালদার বাস ধরতাম। সেখান থেকে ট্রেনে রানাঘাট।

মাঝে শুনেছিলাম, বইমেলা হবে ইকো পার্কে। সেখানে এখনও যাওয়া হয়নি। তবে গুগল ম্যাপে দেখেছি, জায়গাটা অনেক দূরে। কলকাতার মানুষ হয়ত যেতে পারবেন। কিন্তু জেলা বা মফস্বলের লোকের পক্ষে যাওয়া মুশকিল। ফেরা তো আরও মুশকিল। সেন্ট্রাল পার্ক যোগাযোগের দিক থেকে কিছুটা কাছে। মেট্রো হওয়ায় কিছুটা সুবিধাও হয়েছে। সরকার এই প্রাঙ্গণকে স্থায়ী বইমেলা প্রাঙ্গণ হিসেবে ঘোষণাও করেছে। তবু মনে থেকে এই সেন্ট্রাল পার্ককে এখনও মেনে নিতে পারছি না। যাঁরা গাড়ি নিয়ে যাবেন, তাঁরা গাড়ি রাখার জায়গা পাবেন না। যাঁরা বাসে ফিরতে চাইবেন, তাঁরাও ঠিকঠাক বাস পাবেন না। অটোতেও বেশ বিশৃঙ্খলা হবে। শিয়ালদা রুটের লোকেরা তবু ফিরতে পারবেন, কিন্তু হাওড়ার দিক থেকে যাঁরা আসবেন, তাঁদের দুর্ভোগের মুখে পড়তে হবে। কিন্তু ময়দানে হলে নানা প্রান্ত থেকে মানুষ সহজেই আসতে পারতেন। চন্দননগর বা পাঁশকুড়ার লোকেরাও এই ভরসা নিয়ে আসতেন যে, ফিরতে কোনও সমস্যা হবে না।

এখন একটা অদ্ভুত সময়। বিশেষ একজন যে সুরে কথা বলেন, সবাই সেই সুরেই কথা বলেন। তাঁর কথাই ঠিক, এটা প্রমাণ করতেই ব্যস্ত থাকেন। তাই কবি-সাহিত্যিকদের স্বাধীন কণ্ঠস্বর এখন তেমন খুঁজে পাই না। তাই ময়দানকে ঘিরে অনেকের নস্টালজিয়া থাকলেও তা প্রকাশ করতে দেখা যায় না। কী জানি, যদি তিনি রেগে যান! প্রবাস থেকেই আমার দাবি, আবার বইমেলাকে তার হারিয়ে যাওয়া ঠিকানায় ফিরিয়ে আনা হোক। আদালত বা ফোর্ট উইলিয়াম খুশি হবে কিনা জানি না। তবে বইপ্রেমী মানুষ খুশি হবেন।

Germany
2025

নন্দ ঘোষের কড়চা

পথে এসো বাবাজীবন

নন্দ ঘোষ আবার বইমেলায় হাজির। জার্মানির থিম প্যাভিলিয়নেও পৌঁছে গেলেন। তাঁর ইচ্ছে হল গিল্ডের মহাপণ্ডিত মাতব্বর ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়কে একটু প্রেম নিবেদন করবেন। সেই প্রেমপত্র কেমন হতে পারে? পড়ে নিন। জেনে নিন।

বইমেলা মানেই এতদিন দেখে এসেছি উদ্ভট উদ্ভট সব থিম। কোনওবার পেরু, কোনওবার কোস্টারিকা, কখনও গুয়াতেমালা। উরি ব্বাবা। বইমেলার আয়োজকরা কত পণ্ডিত। সব দেশের সাহিত্য এঁদের গুলে খাওয়া হয়ে গেছে। এখন পেরু, চিলি, গুয়াতেমালা— এগুলোই যা বাকি।

আচ্ছা, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে কি চীনের সিনেমা, ইরানের সিনেমা ইত্যাদি থিম থাকে? খাদ্য মেলায় কি মোগলাই খাবার, ইতালিয়ান খাবার ইত্যাদি থিম থাকে? থাকে না। মেলা মানে হরেক জিনিস ছড়িয়ে থাকবে। যার যেটা খুশি

কিনবে। মেলার আবার থিম কী হে?

কিন্তু বইমেলায় থিম থাকে। এবং থিমের লিস্টি দেখে মনে হবে, বাংলা ভাষার, ভারতের সব ভাষার সাহিত্য গুলে খাওয়া হয়ে গেছে। তাই বিদেশ নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে। আচ্ছা বুকে হাত রেখে বলুন তো, আমরা কজন, সতীনাথ ভাদুড়ির লেখা পড়েছি? অদ্বৈত মল্লবর্ধনের লেখা পড়েছি? জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখা পড়েছি? প্রমথনাথ বিশির লেখা পড়েছি? পড়া দূরের কথা, ৯০ শতাংশ বাঙালি এঁদের নাম শোনেনি। সদিচ্ছা থাকলে এঁদের বইমেলার থিম করা যেত। একেক মেলায় একেকজন। যেমন, গত কয়েকবছর ধরে প্রয়াত সাহিত্যিকদের নামে প্যাভিলিয়ন হয়েছে। ভাল উদ্যোগ। কিন্তু সেখানে ঢুকলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এঁদের কোনও চিহ্নই নেই। এমনকী বাংলা ভাষার বইও খুঁজে মেলা ভার।

বাংলার বাইরে বেরতে চাইলে ভারতের কোনও রাজ্যকে থিম করা যেত। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, অসম, ওড়িশা এই সব রাজ্য থিম হলে আমরা অমৃতা প্রীতম সিং, ইন্দিরা গোস্বামী, ফকিরমোহন সেনাপতি, আর কে নারায়ণন, গিরিশ কারনাড প্রভৃতি সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে জানতে পারতাম। ভিনরাজ্যের সাহিত্য সম্পর্কে, সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা জানি! বইমেলার হাত ধরে যদি ভিনরাজ্যের সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যেত, মন্দ হত না।

কিন্তু ত্রিদিববাবুরা তো আন্তর্জাতিক বইমেলা করেন। রাজ্য বা দেশ নিয়ে থিম করলে তাঁদের মান-ইজ্জত চলে যাবে। তাছাড়া বিদেশ নিয়ে থিম করলে গিল্ড-এর খরচে সেই দেশটা ঘুরে আসা যায়। আমেরিকা, ফ্রান্স, স্পেন ঘোরা হয়ে গেছে। লাতিন আমেরিকাও বাকি নেই। পুরুলিয়ার খবর রাখে না, পেরুর গপ্পো ঝাড়ছে। কখনও থিম হয়েছে কোস্টারিকা, কখনও আবার গুয়াতেমালা। এঁদের গলায় যে কোন মালা পরাই! কতসব বোদ্ধা। কোস্টারিকা, গুয়াতেমালার থিম বুঝে একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছে। কোনদিন হয়তো থিম হবে আন্টার্কটিকা। দু'বছর আগে থিম ছিল স্পেন। মুখ্যমন্ত্রী শিল্প

Kolkata Book Fair 2025
Germany
2025
Focal Theme Country

আনবেন বলে স্পেনে ছুটলেন। কলকাতার ক্লাবের কর্তাদের ধরে নিয়ে গেলেন। বইমেলার কর্তাদেরও নিয়ে গেলেন। না এল শিল্প, না গেল সাহিত্য। এখানে স্প্যানিশ সাহিত্যের জোয়ার বয়েছে নাকি বার্সিলোনা, মাদ্রিদের দোকানে দোকানে বাংলা বইয়ের ছড়াছড়ি!

আগেরবার থেকে কিছুটা যেন সম্বিত ফিরেছে। স্প্যানিশ সাহিত্য থেকে এবার তাঁরা ইংরাজি সাহিত্যে ফিরেছিলেন। মানে, থিম হয়েছিল ব্রিটেন। এবার আবার জার্মানি। সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বইমেলার কথা। প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী এই বইমেলার সঙ্গে কলকাতার তুলনা বহু বছর ধরেই শোনা যায়। গিল্ডের কর্তারা, এই বাংলার লেখকরা বহুবার সেই দেশে ঘুরেও এসেছেন। কিন্তু সে জার্মানিকে এতদিন থিম করা হয়নি, সেটাই আশ্চর্যের। কজন জার্মানির ওই স্টলে গিয়ে ছবি তুললেন আর কজন বই কিনলেন, সেই বিতর্ক না হয় থাক। কোস্টারিকা, গুয়াতেমালার থেকে অন্তত থিম হিসেবে জার্মানি মন্দ নয়।

বিদেশ ঘোরা তো অনেক হল। এবার না হয় দেশের দিকে একটু তাকানো যাক। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে থিম হোক। না হয় হিন্দি দিয়েই শুরু হোক।

(নন্দ ঘোষের কড়চা। বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় একটি বিভাগ। নানা সময় তিনি নানা জায়গায় হাজির হয়ে যান। বাঁকা চোখে, স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় তাঁর পাঁচালি লেখেন। এটিকে মজা হিসেবেই দেখতে পারেন।)

ফিরে এসো, ময়দান

বইমেলা আছে। অথচ, তুমি থাকবে না? কেন জানি না, এত বছর পরেও মেনে নিতে পারি না। মনে প্রাণে চাই, বইমেলা আবার তোমার বুকেই ফিরে আসুক। আমার মতো অনেকেই হয়ত এমনটাই চায়। বইমেলা ছাড়া তুমিও কি ভাল থাকতে পারো! ফিরে এসো, প্রিয় ময়দান। লিখেছেন স্বরূপ গোস্বামী।।

আজ তোমাকে খুব মনে পড়ছে।

না, তুমি কোনও নারী নও। হারিয়ে যাওয়া বন্ধুও নও। তুমি কলকাতা ময়দান।

সেই ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, গড়ের মাঠ। রাজনীতির সভা হলে শুনতাম, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। দুটোই নাকি ভিক্টোরিয়ার উল্টোদিকে। দুটোই নাকি বেশ বড় মাঠ, এদিক থেকে ওদিকে দেখা যায় না। দুটো যে একই জিনিস, জানতে অনেক সময় লেগেছে। কৈশোর পেরিয়ে সদ্য তারুণ্য। ততদিনে বইমেলা নামক বস্তুটি চিন্তা–চেতনার অনেকটা জায়গা নিয়ে ফেলেছে। দুপুর হলেই ঢুকে পড়তাম বইমেলায়। থাকতাম একেবারে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত। বিরাট যে কেনাকাটা করতাম, এমন নয়। পকেটে তেমন টাকাও থাকত না। তবু কী অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ, কী অদ্ভুত এক শিহরণ। হালকা শীত, মন্দ লাগত না। একটু ধুলো উড়ত, তাও মন্দ লাগত না। মাইকের আওয়াজ, সেটাও বেমানান লাগেনি।

মনে আছে, নব্বইয়ের দশকে সেই ময়দানেই প্রথম দেখি আমার প্রিয় সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহকে। সম্ভবত দেজ–এর স্টলে বসেছিলেন। সই দিচ্ছিলেন। টপ করে একটা বই কিনে ফেললাম। লেখককে প্রণাম করে বইয়ে সই করিয়ে নিলাম। সেই বইটা আজও সযত্নে সুরক্ষিত। তার আগে বুদ্ধদেব গুহর কত বই পড়েছি। কত কথা জমেছিল। কিন্তু কেন জানি না, সেদিন কোনও কথাই বলতে পারিনি।

সেই বছরই, বইমেলার শেষদিনে দেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁকেও প্রণাম করেছিলাম। নিজের মুগ্ধতা মেলে ধরেছিলাম। ওই তো জয় গোস্বামী, উনি বোধ হয় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। দূর থেকে দেখছিলাম।

একটু একটু করে মুগ্ধতা যেন ছুঁয়ে যাচ্ছিল সেই তরুণকে।

পরের বছর। হঠাৎ শুনলাম, বইমেলায় আগুন লেগেছে। পরদিন সকালেই ছুটে গিয়েছিলাম। আমার প্রিয় বইমেলা কি আর হবে না? আগুন তাকে থামিয়ে দেবে? কেন জানি না, সেই পোড়া মেলায় ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। অদ্ভুত একটা কান্না যেন বুকের মাঝে জমাট বেঁধে ছিল। সেদিন সন্ধেবেলায় আরেকজনের চোখেমুখে সেই যন্ত্রণা দেখেছিলাম, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কীভাবে সেই পুড়ে যাওয়া বইমেলায় আবার প্রাণ ফিরিয়ে আনলেন, নিজের চোখেই দেখেছি। সেই থেকে মানুষটার প্রতি অদ্ভুত একটা শ্রদ্ধা এসে গেল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মানে আমার কাছে সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রাম নয়, আমার কাছে সেই মানুষটা, যিনি নিঃশব্দে বইমেলায় প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিলেন।

কত সময় গড়িয়ে গেল। বইমেলা তোমার থেকে দূরে সরে গেল। কখনও স্টেডিয়াম, কখনও মিলন মেলা, কখনও করুণাময়ী। যাইনি, এমনটা বলব না। তবে সেই আবেগটা যেন ছিল না। বইমেলা কেমন যেন কর্পোরেট হয়ে গেছে। বই কেনার থেকে খাবারের স্টলে লাইন দেওয়ার লোক অনেক বেশি। পাইকারি হারে উঠছে সেলফি। আর ফটাফট পোস্ট হয়ে যাচ্ছে ফেসবুকে। কেমন যেন অচেনা একটা জায়গা। অথচ, এমনটা তো চাইনি।

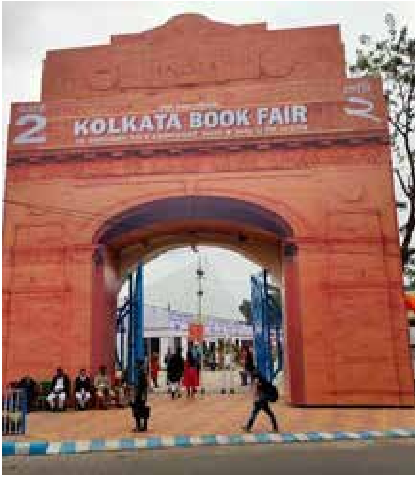

ময়দানে বইমেলা হলে নাকি দূষণ হত। যেন আর কোথাও দূষণ হয় না। চারিদিকে এত দূষণের ছড়াছড়ি। যত রাগ কিনা বইমেলায়! ওই আহাম্মকদের কী করে বোঝাই, বইয়ের দূষণ স্বাস্থ্যের পক্ষে ও চেতনার পক্ষে মোটেই ক্ষতিকারক নয়। বরং বেশ রোমাঞ্চকর।

বইমেলা আছে। অথচ, তুমি থাকবে না? কেন জানি না, এত বছর পরেও মেনে নিতে পারি না। মনে প্রাণে চাই, বইমেলা আবার তোমার বুকেই ফিরে আসুক। আমার মতো অনেকেই হয়ত এমনটাই চায়। কিন্তু সেই আওয়াজ কে কোথায় পৌঁছে দেবে! বইমেলা বাংলার সেরা মেলা ছিল, আছে, থাকবে। তার সঙ্গে তুমিও থেকো। বইমেলা ছাড়া তুমিও কি ভাল থাকতে পারো!

ফিরে এসো, প্রিয় ময়দান।

লেখক কিন্তু নজর রাখছেন

উত্তম জানা

আপনি কিন্তু স্ক্যানারে আছেন।

আপনি বই কিনলেন না কিনলেন না, লেখক কিন্তু ঠিক নজর রাখছেন।

গত বছর থেকেই অদ্ভুত একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে। আপনি স্টলে গেলেন। বই নেড়েচেড়ে দেখলেন। আপনার অজান্তেই আপনার ছবি উঠে যাচ্ছে।

এবার হয়ত বই কিনলেন। ক্যাশমেমো দেওয়ার সময় জানতে চাওয়া হচ্ছে আপনার নাম। আপনি ভাবছেন, ক্যাশমেমো তো আপনাকেই দেওয়া হবে। সমস্যা কোথায়? কিন্তু খেয়াল করলেন না, কার্বন কপিতে আপনার নাম থেকে গেল।

এবার হয়ত বলা হল, স্যার, আপনি বইটা নিয়ে একটু দাঁড়ান। একটা ছবি তুলে নিই। ব্যাস, ছবি উঠে গেল। একটু পরেই হয়ত সেই ছবি হোয়াটসঅ্যাপ মারফত পৌঁছে গেল লেখকের কাছে। অমনি কিছুক্ষণ পর দেখলেন, লেখক তাঁর ফেসবুক পেজে আপনার ছবি আপলোড করে দিলেন। বা, সেই প্রকাশনা সংস্থাও হয়ত ছবি সাঁটিয়ে দিল।

কোনও কোনও লেখক হয়ত কিছুটা সংযমী। তিনি হয়ত আপনার ছবি শেয়ার করলেন না। কিন্তু মুহূর্তে জেনে গেলেন, আপনি তাঁর বই কিনেছেন।

বিপদটা এখানে নয়। বিপদটা আসলে অন্য জায়গায়। আপনি ফেসবুকে সেই লেখকের ফ্রেন্ডলিস্টে আছেন। কথায় কথায় লাইক করেন। মেসেজ করেন। হয়ত কভারের ছবি তুলে তাঁকে পাঠিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে, বইটা কিনেছেন। লেখক কিন্তু জানেন, আপনি আদৌ কিনেছেন কিনা। সুতারং, গুল দেওয়ার আগে সাবধান থাকুন।

আবার কোনও কোনও লেখব ফেবু মারফত পাঠককুলকে জানিয়ে দিলেন, অমুক সময় স্টলে থাকব। বন্ধুরা আসুন, দেখা হবে। আসলে, প্রকাশককে তো বোঝাতে হবে, আমার কিছু পাঠক আছে। আমার বই কিনতে, আমার সঙ্গে দেখা করতে অনেক পাঠক আসে। আমার বই ছেপে আপনি ভুল করেননি।

কিন্তু এত কাণ্ড করেও টিআরপি বিশেষ ওঠে না। বই স্টলে পড়েই থাকে। ফেবু বন্ধুরা যে আসলে পাঠক নয়, এই ভুলটা কবে যে ভাঙবে!

ধন্যবাদ লকডাউন, বই পড়ার অভ্যেস ফিরিয়ে দিলে

নিখিল সেন

মনে আছে, একসময় খুব লাইব্রেরি যেতাম। রোজ একটা বা দুটো করে বই নিয়ে আসতাম। পরেরদিন যেতাম সেগুলো ফেরত দিতে। একদিনেই দুটো বই পড়া হয়ে যেত। যদি দুটো নাও হয়, একটা তো শেষ হতই। সেটাই বদলে নিয়ে আসতাম। যদিও সেই সময় মোটা বই পড়ার অভ্যেস তৈরি হয়নি। লাইব্রেরিয়ান কাকু বলতেন, ওগুলো বড়দের বই। বড় হয়ে পড়বে। আমরাও বিশ্বাস করতাম। তাই ছোটদের জন্য নির্ধারিত বইগুলোই নিয়ে আসতাম। তাছাড়া, ছোট বই একদিনে শেষ হয়। বড় বই শেষ হতে অনেক সময় লাগে। সেই কারণেও ছোটদের বই নিতাম।

তখনও অমনিবাস, বিভিন্ন সংকলনের তেমন চল ছিল না। ফলে ফেলুদা বা কাকাবাবু সমগ্র পড়া হয়নি। খুচরো খুচরো বইগুলোই পড়েছি। কখনও কখনও আগাথা ক্রিস্টি বা শার্লোকহোমসও পড়েছি। গোয়েন্দা কাহিনি থেকে শুরু। পরের দিকে এভাবেই শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, লীলা মজুমদার, সমরেশ মজুমদারদের লেখাও পড়েছি।

মাধ্যমিকের পর থেকেই সবকিছু কেমন যেন বদলে গেল। লাইব্রেরি যেতাম। তবে, আগের মতো নিয়মিত নয়। উচ্চ মাধ্যমিকের পর আরও কিছুটা কমল। এভাবেই বইয়ের সঙ্গে কেমন যেন একটা দূরত্ব তৈরি হল। বইমেলায় টুকটাক বই কেনা হত। সব যে পড়া হত, এমনটা বলা যাবে না। আমার কাছে করোনা ও লকডাউন এক মস্তবড় আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। আবার সেই হারানো বই পড়ার অভ্যেস ফিরে এসেছে। সেইসঙ্গে এসেছে অডিও বুক। আগে এটাকে তেমন পাত্তা দিতাম না। কিন্তু ইদানীং বেশ কয়েকটা ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছি। বেশ ভাল

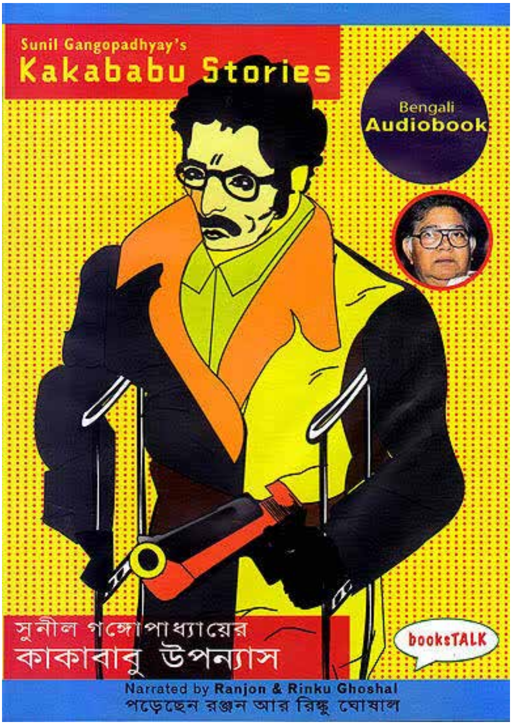
Sunil Gangopadhyay's
Kakababu Stories
Bengali
Audiobook
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
কাকাবাবু উপন্যাস
booksTALK
Narrated by Ranjon & Rinku Ghoshal
পড়েছেন রঞ্জন আর রিঙ্কু ঘোষাল

ভাল কিছু গল্প পাচ্ছি। কয়েকজন তো রীতিমতো ভাল গল্প পাঠ করছেন। বেশ ভাল ভাল গল্প তুলে আনছেন। রোজ এভাবেই বেশ কয়েকটা গল্প শুনে নিচ্ছি।

একসময় রাতে ঘুমোনোর আগে গান শোনার অভ্যেস ছিল। কত রাত এভাবেই ভোর হয়েছে। এখন অন্ধকারে আপন মনে একের পর এক গল্প শোনার অভ্যেস তৈরি হয়েছে। কারও সমস্যাও হচ্ছে না। আর চোখ বন্ধ করে শোনার ফলে মন দিয়ে শোনাও হচ্ছে। গত দু' বছরে অন্তত পঞ্চাশখানা উপন্যাস পড়েছি। শুনেওছি অন্তত পঞ্চাশখানা। আর গল্পের সংখ্যা তো প্রায় হাজার। যাঁদের বই কখনও কেনা হয়নি, যাঁদের লেখা কখনও পড়া হয়নি, কৌতূহলে তাঁদের লেখাও পড়ে ফেললাম, শুনে ফেললাম।

এখন আমার ফোনে অসংখ্য গল্প। সারা দিনে দেড় জিবি ফ্রি নেটের সুবাদে মনের সুখে সেইসব গল্প ডাউনলোড করে রাখছি। এখন স্টক এতটাই যে, এক বছর নেট কানেকশন না থাকলেও চলবে। ওগুলোই ঘুরে ফিরে দিব্যি শোনা যাবে। এই লকডাউন আমার কাছে সেদিক থেকে অনেক উপকারী বন্ধুর ভূমিকা নিয়ে হাজির হল। আমাদের সাহিত্যপ্রেমে যে ধুলো জমেছিল, সেই ধুলো অনেকটাই ঝেড়ে দিল। পাশাপাশি, অডিও বুকের ব্যাপারে যে নাক সিঁটকানো ব্যাপার ছিল, সেটাও অনেকটা কেটে গেছে। যাঁরা সাহিত্যপ্রেমী, অথচ অডিও বুক থেকে এখনও দূরে আছেন, তাঁরা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। সাহিত্যের এই নতুন ধারাকে মুক্তকণ্ঠে স্বাগত জানান।

স্মৃতিটুকু থাক

বইমেলার সেই দুপুরে

বইমেলা মানে কি শুধুই বই কেনা? শুধুই ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া! বইমেলা এলেই আমার কিছু পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে যায়। স্মৃতিটুকু থাক বিভাগে তা ভাগ করে নেওয়া যাক। নয়ের দশকের গোড়ায় কলেজ জীবনে আমাদের সঙ্গে একটি মেয়ে পড়ত। নামটা বলে তাকে আর বিড়ম্বনায় ফেলতে চাই না। মেয়েটির প্রতি আমার একটা দুর্বলতা ছিল। মেয়েটিরও বোধহয় ছিল। কিন্তু কেউ কাউকে কিছু বলতে পারিনি। পরীক্ষার পরই বোধ হয় তার বিয়ে হয়ে যায়। আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। বছর পাঁচেক আগে হঠাৎ বইমেলায় দেখা। সঙ্গে এক পুরুষ, সম্ভবত তার কর্তা। আমি দেখেই চিনতে পারলাম। মনে হয় সে-ও চিনতে পারল।

থমকে দাঁড়াল। কিন্তু তার কর্তা হনহন করে হেঁটে চলেছে। মেয়েটি কিছুটা দ্বিধায়। বরের সঙ্গে সঙ্গে যাবে, নাকি আমার সঙ্গে কথা বলবে! বরের কাছে কী বলে পরিচয় করাবে! আমি কিছুক্ষণ পিছু নিলাম। কিন্তু ডাকার সাহস পেলাম না। কী জানি, কী মনে করবে! যদি অস্বস্তিতে পড়ে যায়! মাঝে প্রায় দু’দশক পেরিয়ে গেছে। সময়ের আয়নায় ধুলো জমে গেছে। তবু পাঁচবছর আগের সেই বইমেলার দুপুরটা বড় বেশি করে মনে পড়ে।

সায়ন্তন দাস, বেলেঘাটা

স্মৃতিটুকু থাক। সেলিব্রিটি নয়, এই বিভাগ হল পাঠকের মুক্তমঞ্চ। ছোট ছোট মন ছুঁয়ে যাওয়া স্মৃতির কথা উঠে আসুক আপনার কলমে। সেই অনুভূতি ভাগ করে নিন অন্যদের সঙ্গে। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com

বেঙ্গল টাইমস

GATE
2
INDIA
KOLKATA BOOK FAIR

বইমেলা সংখ্যা

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in